গল্প

প্রচ্ছন্ন প্রাচীর

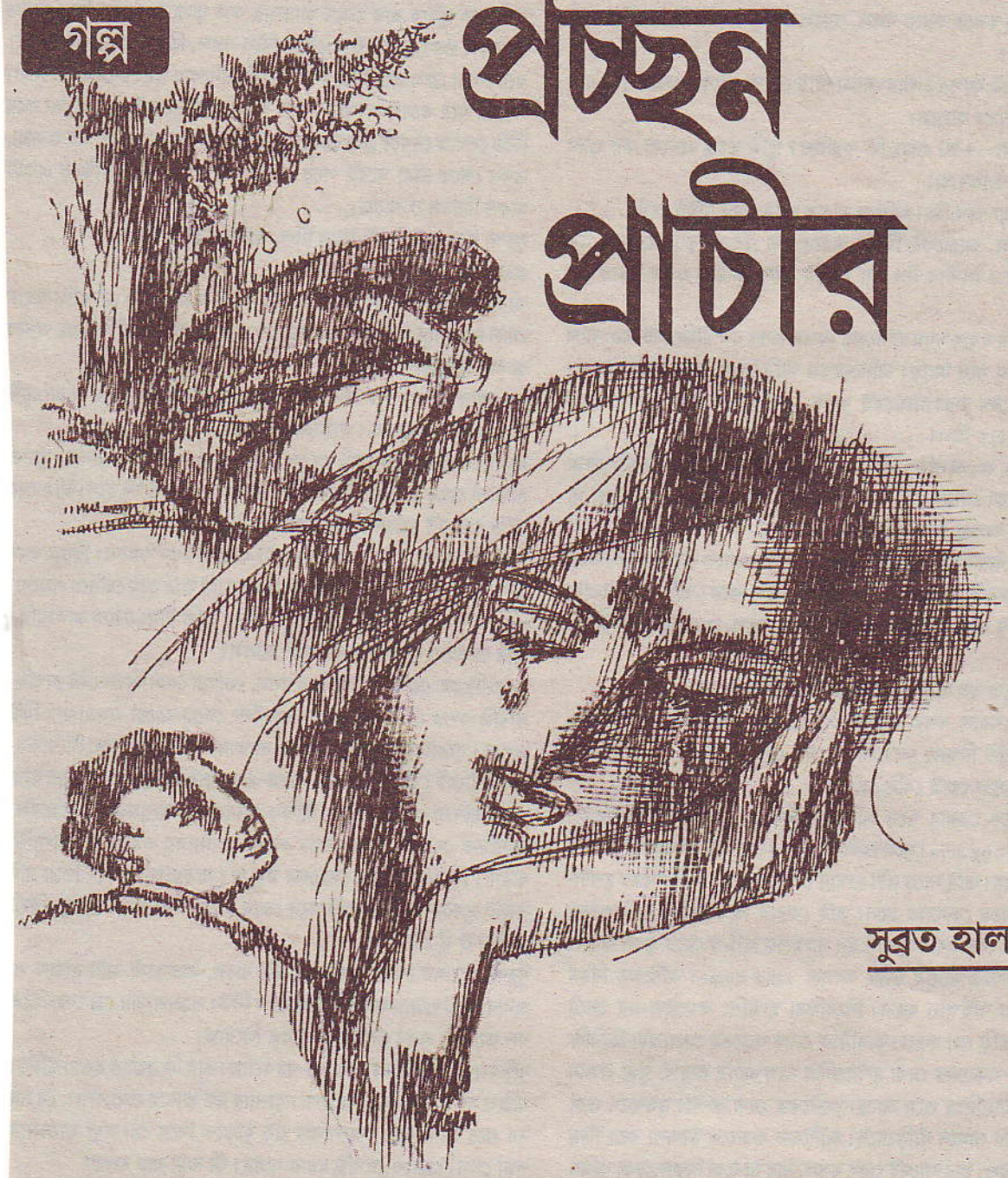

সুব্রত হালদার

বাজার থেকে ফেরার পথে চোখে পড়ল। বাজার যাওয়ার সময় তাড়াহুড়োয় হয়তো খেয়াল করেনি। ফেরার পথে হাউসিং কমপ্লেক্স-এর গেটে গুরুংকে দেখতে না পেয়ে অনিকেত এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। গত সপ্তাহের সোসাইটির মিটিংয়ে তাঁকে সেক্রেটারি হিসাবে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। ফ্লাট ওনার্স ও রেসিডেন্ট অ্যাসোসিয়েসন এর মেম্বারদের অনেকেরই অভিযোগ ছিল গুরুং মাঝে মাঝেই গেট ছেড়ে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়। অথচ অনিকেত জানে ছেলেটা সরল সাদাসিধে কিন্তু দারুণ দায়িত্ববান। আজকালকার দিনে এরকম একজনকে পাওয়াই দুষ্কর। অনিকেত এটাও জানে এই ধরনের হাই সোসাইটি হাউসিং কমপ্লেক্সে অভিযোগের বিষয়বস্তু একেবারেই অপ্রতুল। চব্বিশ ঘন্টা ইলেকট্রিসিটি, অফুরন্ত ওয়াটার সাপ্লাই, রাস্তাঘাট ঝকঝকে, কেতাদুরস্ত কমিউনিটি হল, সুইমিং পুল। সুতরাং ছিদ্রান্বেষণ যাদের স্বভাব তারাই শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে গুরুং-এর পেছনে। গুরুং এর খোঁজে এদিক ওদিক তাকাতেই অনিকেতের চোখ পড়ল ডানদিকের পাঁচিলের গা ঘেঁষে আমগাছটার নিচে গোটা দুয়েক কাপড়ের পুঁটলি সমেত বৃদ্ধাকে। আমগাছটার নিচে একটা চায়ের দোকান ছিল। কমপ্লেক্স-এর সিকিউরিটির কথা ভেবে সোসাইটি কিছুদিন আগে ওটা বন্ধ করে দিয়েছে। দোকানের মালিক সব মালপত্র নিয়ে গেলেও এখনও পাঁচ খুঁটির ওপর টিনের চাল ও সিমেন্ট বাঁধানো মেঝেটা রয়ে গিয়েছে. ওখানেই বৃদ্ধা তার অস্থায়ী একার সংসার পাতিয়ে বসেছে। অফিসের তাড়া আছে তাই গুরুং-এর খোঁজে ছেড়ে অনিকেত ঘরের দিকে পা বাড়াল। মনে মনে ঠিক করে নিল অফিস যাওয়ার সময় গুরুংকে আচ্ছামত ধমক দিতে হবে। বাজারের ব্যাগ দুটো রান্নাঘরে রেখে অনিকেত সুচন্দাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আরেক বিপত্তি এসে উপস্থিত হয়েছে জানো?

সুচন্দা রান্না করতে করতে বলল, সকাল সকাল আবার কি বিপত্তির খবর নিয়ে এলে?

— আরে ওই কালুর চায়ের দোকানটায় কোথা থেকে একজন বৃদ্ধা এসে সংসার পাতিয়ে বসেছে।

সুচন্দা বলল — তা গুরুং কি করছিল? তুমি যতই প্রশংসা কর গুরুং কিন্তু বেশ ফাঁকিবাজ।

— ওর মজা দেখাচ্ছি। অফিসে যাবার সময় এমন টাইট দেব.....।

সুচন্দা বলল, আজকেই বিদায় করতে বল ওইসব ঝুটঝামেলা। দেখ টুয়েলভ-বি-র মিস্টার সিং এর মধ্যেই এসে তোমার ওপর চড়াও হন কিনা।

অফিসে বের হবার সময় অনিকেত দেখল গুরুং যথারীতি গেট-এর পাশে টুলের ওপর বসে আছে। অনিকেতের গাড়ি দেখে গুরুং উঠে দাঁড়াল। অনিকেত বেশ কড়া গলাতেই বলল, সকালে কোথায় ছিলিস। গেট হাটখোলা হয়ে ছিল।

গুরুং বলল, ও ঝোপড়ি বস্তি মে এক লেড়কি কাল রাতমে খুদখুশি কিয়া সাব। ঔসকো দেখনে কে লিয়ে গিয়া থা। ঔসকো ম্যায় পয়চানতা থা সাব। বহুত আচ্ছা লেড়কি থা। ক্যা হো গিয়া কিসকা মালুম্।

অনিকেত খেয়াল করলো গুরুং-এর গলায় প্রিয়জনকে হারানোর বেদনার ছাপ। এইজন্যই গুরংকে অনিকেত এত পছন্দ করে। তা সত্ত্বেও গলাটা কৃত্রিম কর্কশ করে বৃদ্ধার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ও জেনানা কব ইধার আয়া।

— আজ সুবা ইহ আয়া সাব। বহুতই থ্যাকে হুয়ে থে।

অনিকেত খেয়াল করল অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। গুরুংকে বলল, ইনিকো আভি নিকাল দো। আউর গেট ছোড়কে ইধার উধার ঘুমোগে তো মুঝসে বুরা কোই নেহি হোগা।

অফিস থেকে ফেরার পথে অনিকে সুচন্দাকে এস. এম.এস. পাঠাল। **rchg ur ofc by 30m**। সুচন্দার অফিসে বেশ কড়াকড়ি। সকাল দশটাতেই পৌঁছাতে হয়। তাই সাড়ে নটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ে। অনিকেতের দশটা-সাড়ে দশটাতে বেরলেও চলে। তাই ফেরার পথে যেদিন অনিকেতের একটু আগে বের হবার সুযোগ হয় সুচন্দাকে অফিস থেকে তুলে আনে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই উত্তর আসল **rchd home**। অনিকেত বিমর্ষ হয়ে সোজা বাইপাস ধরল। নিবেদিতা হাউসিং কমপ্লেক্স-এর গেটে অনিকেত গাড়ি স্লো করল। ডানদিকে চোখ পড়তেই মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে গেল। সকালের দেখা দৃশ্যাবলির সঙ্গে এটাই তফাৎ, বৃদ্ধা একটা পুঁটুলি মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে। অনিকেত ব্রেক কশল। ততক্ষণে গুরং এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। অনিকেত গুরুংকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই গুরুং বলল, সাব উনিকো নিকালনেকা কসিস কিয়া থা সাব। লেকিন যো হালত মে হ্যায়, বাহার নিকালেগা তো গুজর জায়গা। আঁখো মে উনহি দেখ নেহি সাকতা, চলনা ফিরনা ভি এয়সাহি হ্যায়।

অনিকেত গলাটা যতটা সম্ভব ভারি করে বলল, তাই বলে এখানে। গুরুং অনিকেতের কথার মাঝেই বলল, দো একদিন কে লিয়ে মান লিজিয়ে সাব। উসকো বাদ হাম হি কুছ ইন্তেজাম.....।

অনিকেত কঠোর হওয়ার চেষ্টা করেও পারল না। একজন বৃদ্ধাকে বার করে দেবার কথা বলে নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যাচ্ছে। অনিকেতের নীরবতার মাঝেই গুরুং পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে বলল, দেখিয়ে সাব, পাঁচ-ছে লোক এ রুপিয়া দে কে গিয়া। উনিকো খানে পিনেকো কুছ তকলিফ্ না হো ইস লিয়ে। মেমসাব ভি পঁচাশ রুপিয়া দিয়া।

অনিকেত সুইচে হাত রেখে জানলার কাচ তুলতে তুলতে কিছু বলতে যাচ্ছিল। গুরুং মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, স্রিফ দো চার দিন সাব।

ঘরে ফিরে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে নিয়মাফিক অনিকেত ড্রইং রুমে এসে বসল। পাশের ঘরে ওদের একমাত্র সন্তান রিমো পড়ছে। তাই ভল্যুম লো করে টিভি দেখতে দেখতে ড্রইং রুম থেকেই অনিকেত গলা ছাড়ল, এই শুনছো, তখন থেকে রান্না ঘরেই পড়ে আছো। এদিকে এসো, টিভিতে একটা দারুণ জিনিস দেখাচ্ছে।

সুচন্দা রান্নাঘর থেকেই উত্তর দিল, আস্তে। রিমো পড়ছে।

ওর ঘরের দরজা বন্ধ রে বাবা!

তা দারুণ জিনিসটা কী শুনি? ওয়াল্ড কাপ রিপ্লে? নাকি রোনাল্ডিনহোর গোল? তোমার পাল্লায় পড়ে ওসব দেখে দেখে চোখ পচে গিয়েছে. ওসবে আমার ইন্টারেস্ট নেই।

— আরে না-না। নেট জিও-তে। একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধ এভারেস্টে উঠছে। ওয়াল্ড রেকর্ড। তাড়াতাড়ি এসো।

কড়াইতে ছ্যাত করে গরম তেলে কিছু পড়ার আওয়াজ আসল। সুচন্দা রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে উত্তর দিল, ওসব দেখে লাভ কি হবে। আমাদের দৌড় তো ওই দার্জিলিং নয় দীঘা। তুমিই দেখ।

অনিকেত বলল, ভাবছি এবার একটা এক্সপিডিশন করবো। রিমো যখন স্কুল থেকে এডুকেশনাল ট্যুরে যায় তখন আমি আর তুমি বেরিয়ে পড়বো।

— কোথায়? শিলিগুড়ি থেকে ফুটসিলিং নাকি দীঘা থেকে তালসারি?

শ্লেষ মেশানো সুচন্দার গলা ভেসে আসল।

— অনিকেত শ্লেষটা অবজ্ঞা করে বলল, তোমার কোন ভিশন নেই দেখছি। ভাবছি এবার ট্রেকিং-এ যাবো। দার্জিলিং থেকে আরো একহাজার ফিট ওপরে। পুরোটাই ট্রেকিং করে। গত বছর অফিসের পরিমলরা গিয়েছিল।

— সিগারেট খেয়ে খেয়ে তো লাংক্স-এর দফারফা করেছ। তোমার দ্বারা ও সব হবে না। সুচন্দা অভ্যাস মাফিক অনিকেতের আত্মমর্যাদায় ঘা মারল।

অনিকেত সেটাকে অবজ্ঞা করে বলল, তোমাদের ওইসব উল্টোপাল্টা ধারণা। সিগারেটে কিছু হেরফের হয় না। সাতহাজার ফিটে গিয়ে যদি একটা সুখটান মারতে পারি তবে জেনে রাখো সিওর আটহাজার ফিটে এভারেস্ট ছুঁয়েই নামব।

সুচন্দা রান্নাঘর থেকে একটু জোরেই বলল, এভারেস্ট আট হাজার ন জনাব। আটহাজার আটশো আটচল্লিশ ফিট। পড়াশোনায় তো ভাল ছিলে বল শুনেছি। এখন দেখছি মাথাটাও গিয়েছে।

বুড়ির ব্যাপারটা মনের মধ্যে খচ-খচ করছে। তার কি কঠোর হওয়া উচিত। মস্তিষ্ক বলছে হ্যাঁ। মন বলছে না। সুচন্দার মত জানার জন্য বলল, সে সব নয় পরে ভাবা যাবে। আপাতত ওই বুড়িকে নিয়ে তো মহা ঝামেলায় পড়া গেল। গুরুংও দেখছি দয়ার সাগর। কী করা যায় বলত?

রান্নাঘর থেকে কোন উত্তর এল না। ফুটন্ত তেল-জলের যুদ্ধে আর চিমনির শব্দবাণে কথাটা বোধহয় সুচন্দার কানে পৌঁছায়নি। অনিকেতই আবার বলল, বুড়িটার কপালও বটে। হয়ত ছেলে মেয়ে ছিল। তারা এখন মজায় ঘর সংসার করছে আর বুড়িটার ভাগ্যে গাছতলা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও সুচন্দার কোন অভিমত পাওয়া গেল না। অনিকেত নিজেই আবার বলল, ভাবছি কাল সকালে নিজে গিয়েই বের করে দেব। তা না হলে সোসাইটির সেক্রেটারি হিসাবে আমাকেই লোকে যা তা বলবে।

রান্নাঘর থেকে সুচন্দার ঝাঁঝালো গলা ভেসে আসল। তুমি চুপ করবে। ও ঘরে রিমো পড়ছে আর তখন থেকে বকবক করে যাচ্ছ। কে বলেছে তোমায় সেক্রেটারি হতে। যত্তসব!

অনিকেত আত্মপক্ষ সমর্থনের স্বরে বলল, হিস ডোর ইস ক্লোজ।

সুচন্দার কাটা কাটা স্বরে বলল, ক্যান ইউ স্টপ নাও, প্লিজ।

দিনচারেক হয়ে গেল অনিকেতের নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই কাটছে। হঠাৎ করে ভ্যাট চালু হয়ে যাওয়ায় সেলসম্যান থেকে এ্যাকাউন্টট্যান্ট পর্যন্ত সবাই অনিকেতের পেছনে পড়ে আছে। কোথায় কত পার্সেন্ট চার্জ করতে হবে অনিকেতকেই ডিসিশন দিতে হচ্ছে। ভুলচুক হয়ে গেলে তার ঘাড়েই এসে পড়বে যত দোষ। সোসাইটিতেও তলে তলে একটা বিদ্রোহ দানা পাকিয়ে উঠছে ওই বৃদ্ধাকে নিয়ে। অনিকেত সেক্রেটারি হয়েও কেন সমস্যাটা জিইয়ে রেখেছে সেটাই কারণ। শুক্রবার রাতে অনিকেত সাধারণত সুচন্দা ও রিমোকে নিয়ে ডাইনিং আউট-এ যায়। আজকে অনিকেত খেয়াল করল সুচন্দা রান্নাঘরেই ব্যস্ত। তাই তারও কোন সম্ভাবনা নেই। অনিকেত অফিসের কিছু পেণ্ডিং কাজে মন দিল। রোজই এইসময় মায়ের অগোচরে রিমো বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে যায়। আজও তার অন্যথা হল না। রিমো চাপা গলায় প্রশ্ন করল, বাবা ওই ঠাকুমাকে তুমি দেখেছ?

অনিকেত চমকে উঠল। মা মারা গিয়েছে অনিকেত যখন ক্লাস সিক্সে পড়ে। পরক্ষণেই বুঝল গাছতলার ওই বৃদ্ধার কথাই রিমো বলছে। অনিকেত বলল হ্যাঁ দেখেছি। কেন?

— ঠাকুমা না খুব ভালো। কী সুন্দর গল্প বলে।

— তাই নাকি। কী গল্প বলল?

— অনেক গল্প। রোজ একটা করে। আমরা তো দল বেঁধে রোজ গল্প শুনতে যাই। আজকে না নীলকমল লালকমলের গল্প বলছিল। তুমি গল্পটা জানো?

— হ্যাঁ জানি।

— বলনি তো?

— আমার অত সময় কোথায়। ওসব ঠকুমা-দিদিরাই বলে।

— নীলকমল না দারুণ সাহসী। সমুদ্রে রতলা থেকে একটা ডেভিলের.....।

— ডেভিল না রাক্ষস।

— হ্যাঁ রাক্ষস। রাক্ষসটা না প্রাণভোমরা লুকিয়ে রেখেছিল।

— আমি জানি।

— বাবা উনি গাছতলায় থাকেন কেন? ওনার কি কেউ নেই?

— আছে হয়ত। তারা হয়তো খবর নেয় না।

রিমো কিছুক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, আমাদের এখানে তো অনেক ফ্লাট খালি পড়ে আছে. ওখানে ওঁকে রাখার ব্যবস্থা করে দাও না।

— ধূর বোকা। তা কি হয়। যাদের ফ্লাট তারা রাজি হবে?

রিমো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাদের সিঁড়ির পাশে স্টোর রুমটা তো খালিই পড়ে আছে, ওখানে ওঁকে থাকতে দাও না। গাছতলায় কত কষ্ট করে আছেন।

এমন সময় রান্নাঘর থেকে সুচন্দা বেরিয়ে এল। বোঝা গেল সুচন্দার অগোচরে ভাবলেও আসলে তার প্রশ্রয়েই রিমো এই ব্রেকটা পায়।

সুচন্দা রিমোর হাত ধরে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সুচন্দার যাওয়ার পথে ছুঁড়ে দেওয়া কথাগুলো অনিকেতের কানে আসল। পড়াশুনো ছেড়ে ডেপোঁমি হচ্ছে। আর যদি শুনেছি ওই ওঁর কাছে গল্প শুনতে গিয়েছিলে তবে মেরে ঠ্যাঙ ভেঙে দেবো।

রিমোকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সুচন্দা দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

অনিকেত প্রতিবাদের স্বরে বলল, ওর দোষটা কোথায় দেখলে। রাদার আই হ্যাভ নোটিসড্ দ্যাট ইউ আর বিকামিং এ ক্যপটিভ ডে বাই ডে দিস ইজ টু মাচ্।

সুচন্দা কোন উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

সপ্তাহ ঘুরে গেল, সমস্যার কোন সমাধান হল না। কোনটা ঠিক তা অনিকেত নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। বুড়ি নিউটনের স্থিতিজাড্যের জীবন্ত উদাহরণ হয়ে উঠেছে। অনিকেত এখানকার পুরোনো বাসিন্দা। হাউসিং কমপ্লেক্স-এর শুরু থেকেই আছে। সেই হেতু প্রায় সবারই হাব-ভাব, চরিত্র অনিকেতের নখদর্পণে। সেই হিসাবে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন তার কাছে এসে অভিযোগ জানানোর কথা। কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। সেটাই আরো চিন্তার কারণ।

অবশ্য তার অন্য একটা কারণও থাকতে পারে। প্রথম প্রথম মানুষগুলো হয়তো কমপ্লেক্সের বৃত্তের মধ্যেই সবকিছু চিন্তা ভাবনা করত। তারপর যত দিন যাচ্ছে বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। সমাজ থেকে পরিজন, পরিজন থেকে পরিবার, পরিবার থেকে আত্মতৃপ্তিতেই নিমগ্ন। অত সময় কোথায় সোটাইটির কোন কোণে কে শুয়ে আছে সেদিকে নজর দেবার। অনিকেতের মনে পড়ে গেল একটা ছবির কথা। পত্রিকায় 'কিসের ছবি' সমাধান করা ছোটবেলায় অনিকেতের প্রিয় ছিল। একবার একটা ছবি কিছুতেই চিনতে পারছে না। ছবিটায় একটা বৃত্ত, তারমধ্যে আর একটা বৃত্ত। এইভাবে বৃত্তগুলি ক্রমশ ছোট হতে হতে মিলিয়ে গিয়েছে। পরের সংখ্যায় উত্তর দেখল - পাতকুয়া। ছবিটা পরিষ্কার হল। যত অতলে নেমেছে, বৃত্ত তত ছোট হয়েছে। সে যাই হোক, নীরবতার আসল কারণ কী তা আজ পরিষ্কার হবে। সিক্সটিন-এফ এর মিস্টার মুৎসুদ্দির আজ টেনথ্ ম্যারেজ এনিভারসারি। সেখানে ক্লোজ ফ্রেণ্ডসদের অনেকেই নিমন্ত্রিত। জল কোনদিকে গড়াচ্ছে তার আভাস নিশ্চিই পাওয়া যাবে।

মিস্টার মুৎসুদ্দির ড্রইংরুমটা বেশ সুন্দর করে সাজিয়েছে। অনিকেত খেয়াল করল প্রথম দর্শনেই সুচন্দা চারদিকের সবকিছু মগজে ভরে নিল। তার মানে আর একপ্রস্থ ঝঞ্ঝাটের বীজ অঙ্কুরিত হল। সুচন্দার ইচ্ছা ওদের ড্রইংরুমটা রি-ডেকরেট করার। বেশ কয়েকবার এই নিয়ে আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। অনিকেত উৎসাহ না দেখানোয় কয়েকবার পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়েছে। শেষপর্যন্ত কথা কাটাকাটিও। অনিকেত ধৈর্য্য হারিয়ে বলেছে, থাকতে তো শহরের বাইরে। স্যাতস্যাতে দু-ঘরের একটা বাড়িতে। সেই তুলনায় এটাই যথেষ্ট।

সুচন্দাও গলা চড়িয়েছে। তুমি রাজপ্রসাদে থাকতে মনে হচ্ছে।

— তা বলছি না কি। আমার অবস্থা তো আরো অধম ছিল। গণ্ডগ্রাম। তাতে কি হল?

— কী ছিলাম, তাই ভেবে সেরকমই থাকতে হবে নাকি?

সুচন্দাকে রাগিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করার খেলা অনিকেতের প্রিয়। তাই জ্বলে ওঠা আগুনটায় বাতাস দিল। আমি তো ভাবছি সব সময়ের একজন মেড সার্ভেন্ট রাখব। তোমার ওপর যা ধকল যাচ্ছে তাতে একটা সব সময়ের লোকের খুবই দরকার। তবে তার থাকার জন্য তো এই ড্রইং রুমটা ছাড়া আর গতি নেই। তখন?

অনিকেতের কথায় কাজ হল না। হয়তো ব্যাপারটা ওর ভাবনারও অযোগ্য তাই। সুচন্দার কড়া দৃষ্টি ঠোঁটের কোণের চিলতে হাসিটাকে আড়াল করতে পারল না।

— সামলে নিয়ে অনিকেত বলল, তা নয় না হল। তবে যা আছে তাই তো যথেষ্ট। আবার খরচ বাড়ানোর কোন মানে আছে? এখনও ফ্লাটেই ই.এম.আই শেষ হয়নি। রিমোও তো বড় হচ্ছে। ওর পড়াশোনার জন্যই তো কিছু সেভ করা দরকার।

— সব ব্যাপারেই তোমার ওই একই অজুহাত। তোমার আর কী। এই সব হাই সোসাইটিতে থাকতে গেলে তোমার মত ক্যালাস হলে চলে।

আর দশটা ফ্লাটে গিয়ে দেখ। তাদের ড্রইংরুমগুলো কেমন দিনের পর দিন ভোল পাল্টাচ্ছে। আর আমরা সেই.....

— তাতে কী এসে গেল?

— সে তুমি কী বুঝবে. একটা স্ট্যাটাস-এর ব্যাপার আছে তো।

— স্ট্যাটাস? অনিকেত হো হো করে হেসে উঠল। মাধ্যমিকে কারেক্ট স্পেলিংটা লিখতে পারিনি বলে এক নাম্বার কাটা গিয়েছিল। না হলে ইংলিশেও লেটার থাকত বুঝলে।

অনিকেত এমনিভাবেই বারবার আলোচনাটা লঘু করে দিয়েছে। সুচন্দাও তর্ক বেশিদূর টানতে পারে না বলেই রক্ষে। তবে অনিকেত এটা বোঝে যে সবকিছুকে সে যেমন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে সুচন্দা তা পারে না। বিত্তের স্তরে না হোক প্রকাশে, নিম্ন থেকে মধ্য ও উচ্চে উন্নীত হওয়ার দৌড়ে ও সামিল হয়ে পড়েছে। বাস্তবকে অস্বীকার করে আভিজাত্যর অভিনয়েও ওর আপত্তি নেই। যার জন্য ও নিজের মানবিক, আর্থিক স্বার্থ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। অক্ষমতার দিকগুলিকে আড়াল করতে নিজের অজান্তেই নিজের চারিধারে গড়ে তুলেছে অদৃশ্য প্রাচীর। সেই গণ্ডির মধ্যেই ছড়িয়ে রেখেছে নিজের সুখ সমৃদ্ধি ভাল লাগার উপাদানগুলিকে। অবশ্য অনিকেত জানে সেও আলাদা কিছু না। পরিচিত মহলের বেশিরভাগই একই শোভাযাত্রায় সামিল। তফাত যেটুকু তা গণ্ডির পরিধির মাপে।

দীপকের হাতে বড় প্লাস্টিক ব্যাগটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল নিশ্চয়ই কোন রহস্য ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে। দীপকের স্ত্রী সোনালী মিস্টার ও মিসেস মুৎসুদ্দিকে ধরে-বেঁধে সোফায় পাশাপাশি বসাল। তারপর দীপকের হাতের ঝোলা ব্যাগটা থেকে দুটো বড় রজনী গন্ধার মালা বের করে ওদের হাতে দিল। সবাই বুঝে গেল উদ্দেশ্যটা। তারপর হইচই চাপাচাপির মধ্যে চলল মালাবদল। মোবাইল ক্যামেরায় ফটাফট বন্দী হয়ে গেল তার স্থির ও সচল ছবি। মুৎসুদ্দির নার্সারিতে পড়া আদুরে মেয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে দেখল কাণ্ডকারখানা। শেষে কিংকর্তব্য বুঝতে না পেরে চলে গেল পাশের ঘরে। মালাবদল পর্বের শেষে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসল ড্রইংরুমে। মিস্টার মুৎসুদ্দি মাঝের টেবিলের খালি গ্লাসগুলোর সদ্ব্যবহারে নিবিষ্ট হল। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ এটাই, যদিও ডিনারের বন্দোবস্ত আছে। মহিলারা বেশিরভাগই নরমে আসক্ত হলেও পুরুষদের মধ্যে কাউকে পাওয়া গেল না যে মিষ্টার মুৎসুদ্দির সদ্য বিদেশ থেকে আনা ডিউটি ফ্রি শপের ব্লাক-ডগ-এ ভীত। এক পেগ চড়তে না চড়তেই সেই আলোচনা শুরু হয়ে গেল অনিকেত যার প্রতীক্ষায় ছিল।

হীরক অনিকেতকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোকে তো এবার সেক্রেটারি পদ থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে হবে দেখছি।

অনিকেত না জানার ভান করে বলল, কেন? হঠাৎ কী হল।

হীরক বলল, কী হল? শালা ট্রেসপাসার্স পুশছিল আবার না জানার ভান করছিস। হীরক দু-এক পেগ চড়লেই এরকম মাইল্ড আনপার্লামেন্টারি শব্দ ব্যবহার করে। ক্লোজ সার্কেলের সবাই এতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছে। অনিকেতও হীরকের কথায় মাইন্ড করল না। সোসাইটিতে অনিকেতের সত্যিকারের কেউ সুহৃদ থাকলে সেটা যে হীরক তা অনিকেত জানে। ওর ক্যাম্পেইনিং আর চাপাচাপিতেই অনিকেত বছরের পর বছর সেক্রেটারি হয়ে আছে। হীরকের কথার রেশ ধরে আলোচনা চলতে থাকল। বেশিরভাগই বৃদ্ধাকে ওখানে থাকতে না দেবার পক্ষে। কেবলমাত্র মিসেস বোসই বলল, তোমাদের কী অসুবিধা হচ্ছে। একজন বৃদ্ধা মানুষ, কয়েকদিন ওখানে যদি শান্তিতে থাকে তবে আমাদের কী এমন ক্ষতি হয়ে যাবে?

মিসেস মুৎসুদি মিসেস বোসকে উদ্দেশ্য করে বলল, না শীলা, তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। হতেও তো পারে ওই মহিলা যৌবনে কোন প্রস্ ট্রস্ ছিল। সোসাইটির বাচ্চাগুলো ওর কাছে যায়। কী রোগভোগ বাধিয়ে এসেছে কে জানে।

— স্টুপিড। সবার দৃষ্টি সুচন্দার ওপর পড়ল। মিসেস মুৎসুদ্দি একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে না জেনে এমন নোংরা শব্দ উচ্চারণ করাটা কী ঠিক? মিসেস মুৎসুদ্দি থতমত হয়ে বললেন, না, তা না। কিন্তু এরকম কেসে বেশিরভাগই তো.....।

কেউ কোনও উত্তর দিল না।

গতকালের ঘটনার পর অনিকেত ঠিকই করে নিয়েছে যে এবার তাকে কড়া হতেই হবে। অনিকেত বাজারের ব্যাগটা নিয়ে একটু আগে আগেই বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য প্রথমে বৃদ্ধার ব্যাপারে গুরুংকে আলটিমেটাম দেওয়া, তারপর বাজার। দূর থেকে খেয়াল করল সোসাইটির জনাচারেক তরুণ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। কমপ্লেক্সের মাঝের মাঠটায় এক্সসাইজ করে মাঝে মাঝেই ওরা গেটের কাছে জটলা করে। কিন্তু আজ অন্যরকম কিছু মনে হচ্ছে। অনিকেত কাছে যেতেই অশোক নামের ছেলেটা এগিয়ে এসে বলল, অনিকেতদা, ওই বৃদ্ধা মনে হচ্ছে কাল রাতেই মারা গিয়েছে।

অনিকেত কিছুক্ষণ বোধহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অশোকের বন্ধু সুনির্মল বলল, ওঁর তো কিছু একটা বন্দোবস্ত করতে হবে।

অনিকেত প্রশ্ন করল, কী বন্দোবস্ত করবে। এতো দেখছি এখন থানাপুলিশ হবে।

অশোক বলল, সে সবের ভয় নেই। আমি একটা এন.জি.ও-কে জানি যারা স্ট্রিট অরফ্যানদের নিয়ে কাজ করে। ওদের খবর দিলে ওরাই য করার করবে।

অনিকেত আশ্বস্ত হল। বলল, তা হলে তো ভালই। তা ওদের খবর দিয়েছিস।

— এখনও দিইনি। কিছু খরচাপাতি তো হবেই। সোসাইটির ফাণ্ড থেকে হাজার খানেকের ব্যবস্থা করে দাও না।

অনিকেত একটু চিন্তা করে বলল, সোসাইটির ফাণ্ড থেকে দেওয়া তে মুশকিল। এমনিতেই নানান ঝামেলা চলছে। অনিকেত মানিব্যাগ থেকে দুটো একশো টাকার নোট অশোকের হাতে দিয়ে বলল, বাকিটা আর কয়েকজনের কাছ থেকে তুলে নে। দীপক, হীরক, কমল ওদের কাছে গেলে পেয়ে যাবি। ইতিমধ্যে এন.জি.ও-তে খবরটা দিয়ে দে।

সবাই অনিকেতের কথায় সম্মতি জানাল।

অনিকেত বাজারের দিকে পা বাড়াল। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

অনিকেত বাজার থেকে ফিরে দেখল নিয়মমত সুচন্দা তার জন্যই অপেক্ষা করছে। রাতেই ও সকালের রান্নাও করে রাখে. অনিকেত বাজার থেকে ফিরলে কোনমতে মাছটাই টাটকা রান্না করে দেয়। সেটাও অনিকেতের পছন্দের কারণে। অনিকেত বাজারের ব্যাগটা রান্নাঘরে রাখতে রাখতে বলল, শুনছো, কাল রাতেই বৃদ্ধা মারা গিয়েছে। অশোক, সুনির্মল ওরা কোন এক এন.জি.ও-কে ধরে সৎকারের ব্যবস্থা করছে। রান্নাঘরে ব্যাগটা রেখে অনিকেত ড্রইং রুমে আসল। অফিসের শার্ট, প্যান্ট গোছানোর মাঝেই খেয়াল করল সুচন্দা বাজারের ব্যাগ থেকে মাছের প্লাস্টিকটা বের করে ফ্রিজে ভরে রাখল। তরপর বেডরুমে ঢুকে গেল। অনিকেত আলমারি খোলার আওয়াজ পেল। কিছুক্ষণ পরে সুচন্দা বেডরুম থেকে কাগজে জড়ানো কিছু একটা নিয়ে বেরিয়ে আসল। কাগজের প্যাকেটটার কোণা থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা কালোপেড়ে সাদা শাড়ি। সুচন্দা দরজার দিকে মুখ করে বের হতে হতে বলল, আমি একটু আসছি। অনিকেতের মনে পড়ে গেল শাড়িটার কথা।

প্রায় বছর বারো পরে শাড়িটা দেখল। ওটাকে যে সুচন্দা যত্ন করে তুলে

রেখেছে সেটাই অনিকেতের জানা ছিল না। অনিকেত তখন সবে বিয়ে করেছে। একটা সাদামাটা চাকরি করে। সুচন্দা হাউস ওয়াইফ। বিয়ের দিন পনেরো পর শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার আগের দিন সুচন্দা বায়না ধরল গড়িয়াহাট যাওয়ার। অনিকেত জানতো উদ্দেশ্যটা কী। সুচন্দা ওখানে গিয়ে বাবার জন্য শার্ট ও প্যান্ট-এর পিস কিনল। অনিকেত খুনশুটি করে বলল, প্রত্যেকবার শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় আমাকে এইসব কিনতে হবে নাকি। তাহলে তো ফতুর হয়ে যাব।

সুচন্দা আড়চোখে অনিকেতের দিকে চেয়ে বলল, আমি বলছি না কি প্রত্যেকবার। প্রথম যাচ্ছো কিছু নিয়ে যাবে না?

তারপর সুচন্দা হকার্স কর্ণারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আর একটা জিনিস কেনার আছে, ওদিকে চল।

অনিকেত কপট বিস্ময় দেখিয়ে বলল, আরেকটা! সুচন্দা ওর একটা হাত ধরে টানতে টানতেই নিয়ে গেল। সুচন্দা একটা কালো পাড়ের সাদা শাড়ি পছন্দ করে প্যাক করতে বলল। অনিকেত বাধা দিল। সুচন্দা একটু অবাক হয়ে গেল। অনিকেত বলল, এটা কার জন্য, তোমার মাসির? সুচন্দা কাচুমাচু মুখ করে আদুরে মাথা নাড়ল। তারপর অনিকেত সুচন্দার হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে আসল। একটা বড় দোকানে ঢুকে অনেক বেছেটেছে বেশ দাম দিয়ে শাড়িটা অনিকেতই কিনেছিল। অনিকেতের মনে পড়ে গেল।

অনিকেত মাকে হারিয়েছে খুব ছোটবেলায়। আর অনিকেত যখন গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে এম.কম. পড়ছে তখন বাবাও চলে যায়। সুচন্দাও মাকে হারিয়েছে তার জন্মমুহূর্তেই। তাই বিয়েটাও হয় সাদামাটা ভাবে, কালিঘাটে। দ্বিরাগমন বলে কিছু ছিলনা। শ্বশুরবাড়ির লোক বলতে অনিকেত দেখেছে সুচন্দার বাবাকে আর এক মামাকে। বিয়ের পর প্রথম শ্বশুর বাড়ি যাওয়া। একমাত্র মেয়েকে আবার কাছে পেয়ে সুচন্দার বাবা আত্মহারা। বাবা-মেয়ের কথা ফুরাতেই চায় না। অনিকেত সময় কাটাতে পাশের ঘরে টিভি খুলে বসে পড়ে। প্রায় মিনিট পনেরো পরে সুচন্দার বাবা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দেখো আমার কাণ্ড। তুমি একা একা এখানে বসে আর আমরা.....।

অনিকেত সপ্রতিভভাবে বল, তাতে কী.....।

— আমারই দুর্ভাগ্য। যার তোমাকে দেখভাল করার কথা সেই সব ছেড়ে চলে গেল। সুচন্দার মায়ের ফটোর দিকে তাকিয়ে সুচন্দার বাবা বললেন।

ততক্ষণে সুচন্দা শাড়ির প্যাকেটা নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অনিকেতকে উদ্দেশ্য করে বলল, চল মাসির সঙ্গে দেখা করে আসি।

সুচন্দার বাবা বলল, যার সঙ্গে দেখা করবি, সে কী আর আছে?

সুচন্দা চমকে উঠে বলল, নেই মানে। কোথায় গেছে?

— তা আমি কী জানি। এত করে বললাম তোরা আসা পর্যন্ত অন্ততপক্ষে থেকে যেতে। বলে কী না, আমাকে আর কী দরকার? যার জন্য ছিলাম তার তো রাজপুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। ওতেই আমার শান্তি। আমি তোমার হেঁসেল আর টানতি পারবনি বলে দিলাম।

— তা তুমি যেতে দিলে, সুচন্দা বাবার উপর ঝাঁকিয়ে উঠল।

— আমি কী যেতে দিয়েছি। অনেক করে বোঝালামও। কিন্তু দিনচারেক আগে দেখি বুড়ি বাক্স-প্যাটরা নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে।

সুচন্দা বলল, জীবনে কখনও মাকে দেখিনি, কিন্তু মা কী তা দেখেছি মাসির মধ্যে। আজ মাসি আমাকে — সুচন্দার গলাটা ভারি হয়ে আসল। অনিকেত খেয়াল করল সুচন্দার গাল বেয়ে নামছে কয়েক ফোঁটা জল। সুচন্দা শাড়িটা ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

সুচন্দা শাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই হীরক এল। হীরক বলল, সর্বহারাদের যা হয় তাই শেষ পর্যন্ত হল। বুড়ি গাছতলাতেই পটল তুলেছে। শুনেছিস?

অনিকেত কোন উত্তর দিল না। হীরক আবার বলল, বুড়িটার ভাগ্যই খারাপ। আজকে হয়তো কোন হস্পিটালে ভর্তি করে দেওয়া যেতো। তার আগেই.....।

অনিকেত হীরকের দিকে ফিরে বলল, হস্পিটালে? কে করত, তুই?

হীরক বলল, হ্যাঁ আমি, কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?

অনিকেত অবজ্ঞাভরে চোখ নামিয়ে নিল।

হীরক বলল, অবাক হচ্ছিস? হবারই কথা। রাস্তায় অরফ্যানদের ধরে ধরে হস্পিটালে নিয়ে যাব এতটা মহান আমি না ঠিকই। কিন্তু করতাম, একটা অন্য কারণে।

— অন্য কারণে? বকাটা তোর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে. ডিস্গাসটিং!

অনিকেত মনের রাগ উগরে দিল। অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই এমন রুক্ষভাবে বলত না। কিন্তু হীরকের সঙ্গে সম্পর্কটা এমন। যা কিছু বলে মনটা হালকা করা যায়।

হীরক যথারীতি রাগল না। বলল, তবে শোন, কালকের পার্টিতে সুচন্দা যখন আগেভাগেই বেরিয়ে গেল, তার কিছুক্ষণ আগে আমি সিগারেট ফোঁকার জন্য বাইরে বেরিয়েছিলাম। সিঁড়িতে সুচন্দার সঙ্গে দেখা। সুচন্দাই বলল, হীরকদা ওই বৃদ্ধার জন্য আপনি কিছু করুন। আমি বললাম, বেশ তো, তোমার বর সেক্রেটারি হয়ে নাম কামাবে আর আমি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

সুচন্দা বলল, ওকে দিয়ে এসব হবে না। আপনি ওঁকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করে দিন। আমি জানি আপনিই পারবেন।

আমি বললাম, হাসপাতালের বয়ে গেছে ওই সব স্ট্রিট বেগারদের নিতে। তুমি পার বটে।

সুচন্দা বলল, তাহলে নার্সিংহোম টোম-এ দেখুন না।

আমি বললাম, নার্সিংহোম! খরচ জানো? তোমার অনি-কে জিজ্ঞাসা করো। সোসাইটি বিয়ার করবে কিনা।

সুচন্দা বলল, সোসাইটিকে দিতে হবে না। আমি দেব।

তখন চার পেগ চড়ে আছে। ভাবলাম তোর বউ যদি এতবড় একটা দায়িত্ব নিতে পারে তবে হীরক মজুমদার কী মরে গেছে। তখনই মনে মনে ঠিক করলাম যে আজকে যে করেই হোক একটা বন্দোবস্ত কিছু করব। কিন্তু বুড়ির ভাগ্যটা দেখ।

অনিকেত সবটা শুনে গেল। কোন উত্তর দেবার তাগিদ বোধ করল না।

হীরক বলল, তোর বউটাকে তো শালা অ্যারিস্টক্যাট বলেই জানতাম। ওর যে এমন একটা লায়ন হার্ট আছে সেটা তো জানা ছিল না।

অনিকেত অফিসের ব্যাগ গোছানোতে ব্যাস্ত হয়ে কথাটা এড়িয়ে গেল।

হীরক বলল, চল এটলিস্ট শ্মশানঘাটের ব্যবস্থা তো করতে হবে।

অনিকেত বলল, তুই যা, আমি আসছি।

হীরক চলে যেতে অনিকেত বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। এই ফাঁকে দাড়িটা কামিয়ে নিতে হবে। ভাবল আজ আর অফিস যাওয়া হবে বলে মনে হচ্ছে না। বাথরুম থেকে ফিরতেই অনিকেত দেখল ইতিমধ্যে সুচন্দা ফিরে এসেছে। সোফার হাতলে দুই হাতে মুখ ঢেকে আধশোয়া হয়ে। অনিকেত জিজ্ঞাসা করল, কী হল অফিসে যাব না নাকি? ন'টা তো বাজল।

কোন উত্তর আসল না। অনিকেত সুচন্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল খোলা পিঠটা দ্রুত উঠছে নামছে। অনিকেত সুচন্দার পাশে বসল। পিঠে হাত রাখল। বলল, প্রাচীরটা ভেঙে ফেললেই পারতে।□